

চরিত্র রূপায়ণ: অভিনেতার প্রস্তুতি ও দায়বদ্ধতা

নূর নবী মিরণ

ভয়েস ট্রেনার ও থিয়েটার কর্মী

বাংলাদেশ

কাজ করার সময় প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো, ঠিক কী নিয়ে কাজ করতে হবে, সেটা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া। এর মাধ্যমে চরিত্রটির প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা সম্ভব হবে আর নিজের ভেতরের শিল্পীসত্তাকে একদম উজাড় করে দেওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, চমৎকার কাজ কখনো এমনি এমনি হয় না। হয়তো কেউ জন্মগতভাবে মেধাবী আর দেখতেও সুন্দর হতে পারে, কিন্তু একজন সত্যিকারের শিল্পীকে তো মানুষের লেখা সেরা কিছু গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে হয়। আর এর জন্য একটু পরিশ্রম তো করতেই হবে, তাই না?

একজন শিল্পী অনেকটা একজন স্থপতির মতো। তাকে কিছু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করতে হয় – যেমন, কী ধরনের বাড়ি বানাতে হবে (এটি চরিত্র), জায়গাটার সঠিক মাপ (এই নির্দিষ্ট প্রয়োজনা), আর একজন গ্রাহক (পরিচালক) যিনি খুঁতখুঁতে হতে পারেন। নিজের বিচারবুদ্ধিকে সম্মান করা উচিত এবং প্রয়োজনে নমনীয় হওয়াও দরকার। কিন্তু কাঠ কিনে পেরেক ঠোকা শুরু করার আগে, আসলে কী করা হবে, সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকাটা খুবই জরুরি।

আবেগের সেতু

একটি কথা মনে রাখতে হবে, চরিত্রের ওপর নির্ভর করে কিছু বিষয় অন্যদের চেয়ে বেশি মন দিয়ে দেখতে হতে পারে। এমন কিছু চরিত্র আছে যেগুলোর জন্য হয়তো খুব বেশি ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্লেষণ করার দরকার হয় না। কারণ, নিজের স্বভাবের কারণেই প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এমনিতেই যোগান দেওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ গ্রামের একজন লাজুক কৃষক হয়, তাহলে লাঙল কাঁধে মাঠে যাওয়া কোনো চরিত্রে অভিনয় করার জন্য খুব বেশি পরিকল্পনা করে চরিত্র গড়তে হবে না। তার জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি হবে এই সময়েই কোনো বাস্তবধর্মী পরিবেশে ঠিক তার মতোই একজন মানুষের চরিত্রে অভিনয় করা। যদি চরিত্রের মূল্যবোধ এবং সাধারণ আচরণ নিজের মতোই হয় এবং মূল গল্পের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়, তাহলে দরকারি সব বিশ্লেষণ "আবেগের সেতু" ব্যবহার করে

পাওয়া যাবে। এর মানে হলো, নিজের আবেগ আর অনুভূতি ব্যবহার করে চরিত্রের সঙ্গে একটি "সেতু" তৈরি করা। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে: "যদি আমি এই পরিস্থিতিতে থাকতাম, তাহলে আমার কেমন লাগত আর আমি কী করতাম?" এটাকে শিল্পের ভাষায় "ম্যাজিক ইফ" বা "যাদুর 'যদি'" -এর সবচেয়ে প্রাথমিক ব্যবহার বলা হয়।

কিন্তু তাই বলে একদমই অলস হয়ে যাওয়া যাবে না। একজন শিল্পী হতে হবে! হতে পারে কেউ হয়তো নিজের মতোই চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারবে, কিন্তু সেই পথে এগোনোর আগে সামনে যা আছে তা মনোযোগ দিয়ে যাচাই করা উচিত। তবে শুধু "আবেগের সেতু" যথেষ্ট হবে না, চরিত্র ও গল্পকে আরও গভীরভাবে দেখতে হবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, একটি সত্যিকারের অসাধারণ কাজ কেবল সচেতন, শৈল্পিক সিদ্ধান্তের ফল হিসেবেই সম্ভব। স্টেলা অ্যাডলার যেমনটা বলেছিলেন, "প্রতিভা প্রকাশ পায় পছন্দের মাধ্যমে।" একটি কাজকে অসাধারণ করে তোলে তার পরিকল্পিত ভাবনা, যা কিনা মঞ্চে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়। অর্থাৎ, একটি পরিকল্পনাকে জীবন্ত করে তোলা।

সামগ্রিকভাবে কাজটি বোঝা

আগে বলা হয়েছিল যে একজন স্থপতির মতো। ওটা ভুলে যেতে হবে। এখন একজন গোয়েন্দার মতো কাজ করতে হবে। গল্পে হয়তো অনেক তথ্য স্পষ্টভাবেই দেওয়া থাকতে পারে – যেমন, কী ঘটেছে বা চরিত্র কী চায়। কিন্তু প্রায়শই তা সরাসরি বলা হয় না। তার সূত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং অনুমান করতে হবে। চরিত্র, এমনকি যিনি চরিত্রটি তৈরি করেছেন, সেই নাট্যকারও হয়তো গল্পের পেছনের সব খুঁটিনাটি সম্পর্কে সচেতনভাবে জানেন না। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য একটি কার্যকরী ধারণা তৈরি করে নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে একটি কাজকে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। যদি এমন কোনো নাটক উপস্থাপন করা হয় যা আগেও মঞ্চস্থ হয়েছে, তবে পুরোনো রিভিউ বা অন্যান্য উৎস নিয়ে গবেষণা করলে অনেকটাই এগিয়ে থাকা যাবে। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞরা সেই নাটকটির গল্প, ধরন, মূল ভাবনা এবং চরিত্রদের সম্পর্ক নিয়ে কী বলেছেন তা জানা যাবে। অবশ্যই, এটি নিজের তদন্তমূলক কাজের বিকল্প নয়, কিন্তু যদি তথ্য হাতের কাছেই থাকে, তবে তার সুবিধা না নেওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রথম অনুভূতি ও বারবার পড়া

যখন প্রথমবার গল্পের মুখোমুখি হওয়া যায়, তখন প্রথম অনুভূতিগুলোর প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল হওয়া উচিত এবং পুরোটা একদম খোলা মন নিয়ে পড়া উচিত। সরাসরি নিজের অংশে চলে গিয়ে কতগুলো সংলাপ আছে তা গোনার লোভ সামলাতে হবে, আর মা যখন দেখতে আসবেন তখন কতটা অসাধারণ কাজ করা যাবে সেই কল্পনাও বাদ দিতে হবে। ধীরে, বন্ধু। এই মুহূর্তে কাজ হলো পুরো গল্পটাকে মন দিয়ে অনুভব করা, একটি শিল্পকর্ম হিসেবে এটি কীভাবে একসূত্রে গাঁথা তা বোঝা। এর মানে হলো, এই প্রযোজনায় কারা জড়িত, এটি আগে কীভাবে করা হয়েছিল, বা এটি অন্যভাবে লেখা হলে আরও ভালো হতো – এই সমস্ত পূর্বধারণাগুলোকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এটিকে নতুনভাবে নিজের উপর প্রভাব ফেলতে দিতে হবে, যেমনটা এটি আছে; ওইসব অন্য বিষয় নিয়ে ভাবার জন্য পরে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

বারবার পড়া উচিত

কী ঘটে? মূল গল্পটি এমনভাবে বোঝা উচিত, যেন এটি কাউকে গল্প বলার মতো করে শোনানো যায়। এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত যা মনে হবে নিজেই একটা জীবন্ত, নির্দিষ্ট জীবনের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে আসা হয়েছে। যেমন, যখন একটি বই পড়া হয়, তখন শুধু অক্ষরগুলো নয়, বরং পুরো গল্পটা চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে, তার চরিত্রগুলো পরিচিত হয়ে ওঠে, আর ঘটনাগুলো নিজেরই অভিজ্ঞতার অংশ বলে মনে হয়। গল্পটা এমনভাবে মনে গেঁথে যাওয়া উচিত, যেন যেকোনো মুহূর্তে সেটা নিয়ে কথা বলা যায়, আর সেটা শুনে অন্যেরাও যেন চোখের সামনে ঘটনাগুলো দেখতে পায়।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন কেউ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কোনো চরিত্রে অভিনয় করছে। শুধু সংলাপ মুখস্থ করলে চলবে না, বরং দুর্গা আর অপূর শৈশব, তাদের গ্রামের পরিবেশ, গ্রামীণ জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি – সবকিছুই এমনভাবে নিজের ভেতর অনুভব করতে হবে, যেন নিজেই সেই জীবনটা যাপন করেছেন। তাদের আনন্দ, দুঃখ, সংগ্রাম, আর একে অপরের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতিগুলো এমনভাবে ধারণ করতে হবে, যেন প্রতিটি আচরণে সেই গল্পের মূল সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন মঞ্চে আসা হবে, তখন হাঁটাচলা, কথা বলার ধরণ, বা এমনকি একটি ছোট হাসিও যেন বুঝিয়ে দেয় দুর্গা বা অপূর মতো চরিত্রগুলো কতটা গভীরভাবে বোঝা গেছে।

কাজের ধরণ বা স্টাইল

একটি উপস্থাপনার সামগ্রিক মেজাজ এবং আত্মা কেমন হতে পারে তা কল্পনা করার চেষ্টা করা উচিত। স্টাইল হলো সেই ধরণ যা এই নির্দিষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, আর এটি গল্পের প্রকার বা ধরনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই কাল্পনিক জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ঘটনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত: এর পরিবেশ, নকশা এবং সাজসজ্জা, মোটিফ – সবকিছুই সুরেলা হওয়া উচিত, যেন এক পটে আঁকা ছবি।

প্রতিবার যখন কেউ একটি চরিত্রে কাজ করে, সে একজন সঙ্গীতশিল্পীর মতো, যিনি একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র শিখেছেন এবং তার সুর কেমন হবে তা তাকে বুঝতে হয়। প্রায়শই এমন একজন শিল্পীকে দেখা যায় যাকে আগে পছন্দ করা হতো, কিন্তু তিনি একটি চরিত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ তিনি সেই ভিন্ন ধরণের স্টাইলের গুণাবলী ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

হতে পারে একটি পছন্দের স্টাইল আছে যা বেশ মানায়, আর ভাগ্যের জোরে হয়তো একটি সফল টেলিভিশন অনুষ্ঠানে কাজ পাওয়া গেল এবং সেই স্টাইল থেকে কখনও না সরে গিয়েই সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা যাবে। সেটা ভালো। কিন্তু যে চরিত্রেই কাজ করা হোক না কেন, তা নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় স্টাইলেই করতে হবে। এটাই কাজ।

কাজটির স্টাইল বোঝার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে ভালো উপায় হলো অতীতে এই ধরনের জিনিস কীভাবে করা হয়েছে তা কল্পনা করা। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: এটা কীসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে? যদি এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির না হয়, তবে প্রায় নিশ্চিতভাবেই এর মতো কিছু সাথে পরিচিত হওয়া গেছে। লেখকরা প্রায়শই একটি প্রিয় স্টাইলে লিখতে পছন্দ করেন, তাই হয়তো তাদের অন্যান্য কাজের সাথে এর তুলনা করা সম্ভব।

স্টাইলের এই বিষয়টি প্রকারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ধরণের গল্পের সাথে নির্দিষ্ট স্টাইল যুক্ত থাকে, আর চরিত্রগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ গুণাবলীর মিল থাকে। একটি রুক্ষ অপরাধ কাহিনীতে চরিত্রদের আবেগ তীব্র থাকবে, যেখানে একটি হালকা কমেডির হাসিখুশি জগতে কেউ হিংস্রভাবে রেগে যায় না বা ভয়ঙ্করভাবে শোকাহত হয় না; সেই গুণাবলী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরক্তি এবং ভাবপ্রবণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

স্টাইল শিল্পীদের কণ্ঠস্বর এবং শারীরিক আচরণের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। যদি এটি একটি বাস্তবধর্মী নাটক হয়, যাকে কখনও কখনও "কিচেন সিন্ধু ড্রামা" বলা হয়, তবে কেউ বিড়বিড় করে কথা বলতে পারে এবং চুলকালে চুলকাতে পারে; কিন্তু যদি এটি একটি

জমকালো হাই ড্রামা হয়, তবে পোশাক যতই আটোসাঁটো হোক বা পরচুলাটি যতই অস্বস্তিকর হোক না কেন, একদম ছোঁয়াছুঁয়ি করা চলবে না।

স্টাইল ভ্যালু রেঞ্জ

একটি গল্পের মেজাজকে বিভিন্ন মানের স্কেলে কোথায় পড়ে তার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে:

- বাস্তবসম্মত বনাম অদ্ভুত
- বিষণ্ণ বনাম উজ্জ্বল
- বিশৃঙ্খল বনাম সুশৃঙ্খল
- রূঢ় বনাম শান্ত
- বিপজ্জনক বনাম নির্ভর
- অমার্জিত বনাম সংযত
- ভয়াবহ বনাম হাস্যকর
- রুক্ষ বনাম চকচকে

কিছু স্টাইলের উদাহরণ

- অ্যাবসার্ড (Absurd): সম্পূর্ণ অবাস্তব, বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে থাকা অদ্ভুত মানুষ। (যেমন: বাংলা নাটকে সেলিম আল দীন বা সৈয়দ শামসুল হকের কিছু ভিন্নধর্মী নাটক)
- (সেলিম আল দীন:
- কিনুনখোলা (১৯৮৬): গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত এই নাটকে লোকসংস্কৃতি, মানবজীবনের জটিলতা এবং সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে।
- কেরামতমঙ্গল (১৯৮৮): মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে নির্মিত এই নাটকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মতো পটভূমি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ঢাকা (১৯৯১): একটি অজ্ঞাত লাশের পরিচয় খুঁজে বের করার আখ্যান নিয়ে রচিত এই নাটকটি সামরিক শাসন এবং গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- যৈবতী কন্যার মন (১৯৯৩): এই নাটকটি সেলিম আল দীনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত।

- হাতহুদাই (১৯৯৭): উপকূলীয় অঞ্চলের শব্দ 'হাতহুদাই' (সাত সওদা) ব্যবহার করে এই নাটকটিতে কথানাট্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
- সৈয়দ শামসুল হক:
 - পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬): কাব্যনাট্য ধারার এই নাটকটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।
 - নুরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২): এই কাব্যনাটকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে একজন কৃষক নেতার জীবন সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে।
 - ঈর্ষা: এটি একটি কাব্যনাট্য।
 - গণনায়ক (১৯৭৬): এই নাটকটিতে সমাজের সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে।
 - অ্যাকশন (Action): একটি জমকালো, কঠিন জগতে বীরত্বপূর্ণ এবং খামখেয়ালী চরিত্র। (যেমন: বাংলাদেশের অ্যাকশন ধর্মী সিনেমা যেখানে নায়ক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে)
 - ব্ল্যাক কমেডি (Black Comedy): একটি ভয়ংকর, খামখেয়ালী জগতে হতাশ মানুষ। (যেমন: হুমায়ূন আহমেদের কিছু উপন্যাস যেখানে জীবনের তিক্ত বাস্তবতা হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়)
 - ক্যাম্প (Camp): একটি বিশেষ সময়ের পটভূমিতে তৈরি, গুরুগম্ভীর কিন্তু নিরাপদ বোকামিতে পূর্ণ। (যেমন: পুরনো দিনের যাত্রাপালা বা বিশেষ থিয়েটার)
 - ফ্যান্টাসি (Fantasy): বীর এবং দানবদের একটি রোমান্টিক, মার্জিত জগৎ। (যেমন: বাংলাদেশের লোককথার উপর ভিত্তি করে তৈরি কোনো ফ্যান্টাসি নাটক বা কমিকস)
 - ফার্স (Farce): কাল্পনিক পরিস্থিতিতে থাকা বোকা এবং ষড়যন্ত্রকারী মানুষ। (যেমন: হাসির যাত্রাপালা বা কিছু প্রহসনমূলক কমেডি)
 - হাই ড্রামা/কমেডি (High Drama/Comedy): চাপা আবেগের আনুষ্ঠানিক, উন্নত জীবন। (যেমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চাঙ্গের নাটক বা সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র)

- ঐতিহাসিক (Historical): একটি সুশৃঙ্খল মঞ্চ যেখানে সুনির্দিষ্ট, রোমান্টিক ঘটনা ঘটে। (যেমন: পলাশীর যুদ্ধ বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র বা নাটক)
- হরর (Horror): একটি সুশৃঙ্খল, বাস্তবধর্মী জগতে ভয়ংকর ঘটনা। (যেমন: বাংলার লোককথার ভূতের গল্প বা কিছু ভৌতিক চলচ্চিত্র)
- লাইট কমেডি (Light Comedy): একটি বিপদহীন জগতে থাকা হাসিখুশি, ভালো মনের মানুষ। (যেমন: নব্বই দশকের বাংলা ধারাবাহিক নাটক বা কিছু পারিবারিক কমেডি)
- মিস্ট্রি (Mystery): একটি জমকালো, ছায়াঘেরা জগতে সরলতা এবং নীচতা। (যেমন: শার্লক হোমস-এর বাংলা সংস্করণ বা গোয়েন্দা গল্প)
- ন্যাচারালিস্টিক ড্রামা/কমেডি (Naturalistic Drama/Comedy): বাস্তবসম্মত, মানবিক গল্প। (যেমন: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক বা সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে তৈরি কোনো কাজ)
- সারিয়াল (Surreal): একটি খাদের ধারে থাকা অন্ধকার, সুন্দর জগৎ। (যেমন: কিছু পরীক্ষামূলক বা প্রতীকী বাংলা নাটক)
- থ্রিলার (Thriller): নির্মমভাবে টিকে থাকার এক মসৃণ জঙ্গল। (যেমন: বাংলাদেশের কিছু সাম্প্রতিক থ্রিলার চলচ্চিত্র বা ওয়েব সিরিজ)
- জেনি কমেডি (Zany Comedy): একটি মুক্ত মহাবিশ্বে মজার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। (যেমন: কিছু দ্রুত গতির, উদ্ভট বাংলা কমেডি)

এই সমস্ত স্টাইল একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে, যেমন হরর যখন ব্ল্যাক কমেডির সাথে মেশে, তখন বিষয়টি একই সাথে সত্যিকারের ভয়ংকর এবং মজাদার হয়। আবার, জেনি কমেডি যখন লাইট কমেডির মেলোড্রামার সাথে মিশে আবেগপূর্ণ অনুভূতি তৈরি করতে সক্ষম হয়।

স্টাইল নিয়ে কথা বলাটা অনেকটা রান্নার ধরণ বোঝানোর মতো। এটা বেশ কঠিন একটা কাজ। যেমন, একটি নিরামিষ তরকারিকে শুধু "শীতের সবজির ঝোল" বললেই সেটার আসল স্বাদ বা অনুভূতি বোঝা যায় না, ঠিক তেমনই কোনো কিছুকে "রহস্য গল্প" বলাটা সেটি দেখার অভিজ্ঞতা কেমন হবে তার একটি অস্পষ্ট ধারণা দেয় মাত্র। কিন্তু এই কথা শুনে ভুল করা

উচিত নয়, প্রত্যেকটি জিনিসেরই নিজস্ব একটা ধরণ আছে। হয়তো সেটা এমন একটা এলোমেলো জগাখিচুড়ি হতে পারে যার মেজাজ সবসময় পাল্টাতে থাকে, তাই কেউ স্বস্তি পায় না; অথবা এটি হয়তো বাস্তবতার মতো দেখানোর জন্য দারুণ চেষ্টা হতে পারে, যেখানে সরাসরি সংলাপ আর আনাড়ি, স্বাভাবিক শিল্পীদের ব্যবহার করা হয়। তবে যা কিছুই তৈরি হোক না কেন, তার নিজস্ব একটা স্টাইল থাকেই।

শৈলী, পরিবেশ এবং মূলভাব বোঝা

একটি কাজের শৈলী বা ধরণ ঠিক করার ক্ষেত্রে, আগের উদাহরণগুলো সাহায্য করার জন্য দেওয়া হয়েছে, নিজের ভাবনা বাতিল করে দেওয়ার জন্য নয়। একজন শিল্পীর সৃজনশীলতা সবসময় কাজে লাগাতে হবে। প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শৈলী দিয়ে কোনো কাজকে নতুনভাবে উপস্থাপন করাটা খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনটা যেন খামখেয়ালিভাবে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকটি মঞ্চে উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রথাগতভাবে এটি শান্ত ও সরল পরিবেশে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু যদি ভিন্নভাবে এই নাটকটি উপস্থাপন করতে চাওয়া হয়, তবে হয়তো আধুনিক বা পরাবাস্তব (surreal) কোনো শৈলী ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, গ্রাম্য পরিবেশের বদলে একটি জ্যামিতিক নকশার মঞ্চ ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে প্রকৃতির উপাদানগুলো প্রতীকী রূপে দেখানো হচ্ছে। তবে, এই পরিবর্তনগুলো শুধু চমক সৃষ্টির জন্য নয়, বরং গল্পের গভীর অর্থ বা মূলভাবকে (theme) আরও ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য হতে হবে, যেন দর্শক নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে চেনা গল্পকে দেখতে পায়। এই ধরনের সৃষ্টিশীল ভাবনা শিল্পীকে আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয় এবং কাজটিতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

গল্পের পরিবেশটা কেমন? (Setting)

গল্পটি যে পরিবেশে ঘটছে, তার সংস্কৃতি আর ভৌগোলিক অবস্থানকে অবশ্যই ভালোভাবে দেখতে হবে। এই সবকিছুই কাজ করার সময় মাথায় রাখতে হবে এবং জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। পরিবেশ শুধু দৃশ্যপটের একটি অংশ নয়, বরং চরিত্রের আচার-আচরণ, কথা বলার ধরণ, পোশাক, এমনকি তাদের চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কোনো চরিত্রে কাজ করে যা গ্রামের মেঠো পথে হাঁটে, তবে তার হাঁটার ধরণ আর শহরের পিচঢালা পথে হাঁটার ধরণ এক হবে না। গ্রামের ধুলোমাটি, কাঁচা

রাস্তা, আর চারপাশের সবুজ পরিবেশের একটি প্রভাব শরীরের ভাষায় আসা উচিত। আবার, যদি চরিত্রটি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের হয়, যেমন সুন্দরবনের লোক, তবে তাদের ভাষা, পোশাক, পেশা (যেমন মাছ ধরা বা মধু সংগ্রহ) এবং সংস্কৃতি কাজে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি। পরিবেশের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক উপাদানই নয়, সেই সময়ের সামাজিক প্রথা, মানুষের জীবনযাপন, এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও চলে আসে। যদি গল্পটি পুরনো ঢাকার কোনো বিশেষ সময়ের হয়, তবে সেখানকার অলিতে-গলিতে মানুষের ভিড়, পুরনো দালানকোঠা, নির্দিষ্ট কিছু উৎসব, বা প্রচলিত রীতিনীতি – এসব কিছুই চরিত্রে একটি নিজস্বতা যোগ করবে। কাজ এমন হতে হবে যেন দর্শক কেবল একটি গল্প দেখছে না, বরং সেই বিশেষ পরিবেশে নিজেকে অনুভব করতে পারছে।

সংস্কৃতি (Culture)

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় গল্পটি কোন সময়ে আর কোন জায়গায় ঘটছে:

- ইতিহাস
- তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ
- শাসন ব্যবস্থা
- সমাজের মূল্যবোধ
- ধর্মীয় রীতিনীতি
- ফ্যাশন বা পোশাক-পরিচ্ছদ
- প্রযুক্তি
- অর্থনীতি (জীবনযাত্রার মান)
- পেশা বা কাজ

মূল্যবোধ আর অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, কারণ সমাজে শ্রেণিভেদ আর বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা নৈতিক মাপকাঠি থাকে। যেমন, মেয়রের ছেলে যদি সবার সামনে মাতলামি করে, সেটা একটা বড় কেলেঙ্কারি। কিন্তু একজন সাধারণ নির্মাণ শ্রমিকের ছেলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটা গুরুতর নয়। আবার, সেই নির্মাণ শ্রমিকের ছেলে যদি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে সে ধনী বাচ্চার চেয়ে বেশি বকাঝকা খাবে। ধনী ছেলেটি হয়তো তার 'নেশার অসুখ'-এর কারণে মানুষের সহানুভূতি পাবে।

ভৌগোলিক অবস্থান (Location)

- এলাকার ধরণ বা ভূখণ্ড
- আবহাওয়া
- স্থাপত্য
- আসবাবপত্র
- আলোর ব্যবহার
- শব্দ
- গন্ধ

চরিত্রগুলো একে অপরের সাথে কীভাবে মেশে?

গল্পের চরিত্রগুলোর ভেতরের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে হবে। সেটা কি একটি পরিবার (আক্ষরিক বা রূপক অর্থে), কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি হওয়া একটি দল, নাকি বিভিন্ন ধরনের মানুষ যারা কোনো পরিস্থিতিতে একসাথে এসে পড়েছে আর নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিচ্ছে? মানুষের যোগাযোগের কিছু মৌলিক ব্যবস্থা প্রতিটি সংস্কৃতিতেই ঘুরেফিরে আসে: যেমন – পরস্পরকে সাহায্য করা প্রেমিক-প্রেমিকা, স্তরবিন্যাস থাকা দল যেখানে দায়িত্ব ভাগ করা আছে, পরামর্শদাতা আর আগ্রহী ছাত্রছাত্রী।

মানুষ সাধারণত পরিবারের কাঠামোর দিকেই বেশি টানে। যেমন, একটি সামরিক দলে নেতা অনেকটা বাবার মতো হয়ে ওঠেন, সার্জেন্ট মায়ের মতো, আর সাধারণ সৈন্যরা সন্তানদের বিভিন্ন ভূমিকা নেয়। স্কুলগুলোতেও এমনটা হয়, যেখানে একজন বয়স্ক, অভিজ্ঞ শিক্ষক আর তার তুলনামূলক নতুন সহকর্মী মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাবা-মায়ের ভূমিকা পালন করে, যেন তারা জ্ঞানের এক বড় পরিবার।

এছাড়াও, সাহিত্যের জগতে কিছু চিরাচরিত জুটি বা দল আছে যা মজার মডেল হিসেবে বারবার ফিরে আসে: যেমন – ঝগড়াটে প্রেমিক-প্রেমিকা, একজন বোকা ও একজন মাতব্বর, বা একজন ত্রুটিপূর্ণ নেতা আর একজন আদর্শবাদী।

খুব কম ক্ষেত্রে চরিত্রগুলো বিমূর্ত ধারণা বা সত্তার প্রতীক হয়। মানুষের সম্পর্কের মতোই, মহাজাগতিক জগতেও কিছু চিরাচরিত দ্বন্দ্ব দেখা যায়: যেমন – বিশৃঙ্খলা বনাম শৃঙ্খলা, লোভ বনাম ভ্রাতৃত্ব, বা আদর্শবাদ বনাম নম্রতা।

এই গল্পটি আসলে কী বলতে চায়?

মূলভাব বা থিম (Theme) বিবেচনা করতে হবে। থিম হলো একটি কাজের ভেতরের বার্তা, এর মূল ধারণা যা সবকিছুকে এক সূত্রে বাঁধে। এটি গল্পের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব আর তার সাথে কাহিনীর খুঁটিনাটি বিষয় কীভাবে সম্পর্কিত, তার মাধ্যমে বোঝা যায়। চরিত্ররা কোন জিনিসটা গ্রহণ করছে বা অস্বীকার করছে, তার মধ্যেই থিম লুকিয়ে থাকে। সাধারণত শিরোনাম দেখলেও থিম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শৈলীর মতোই, লেখকদেরও কিছু প্রিয় থিম থাকে এবং তাদের কাজের মধ্যে সেই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। লেখকের জীবনী থেকেও তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

শিল্পীরা কখনও কখনও মূলভাব বা থিমের বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না, আর তাই এ বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলেন। তাদের ভয় হয়, পাছে লোকে তাদের অজ্ঞ বা ভানসর্বস্ব মনে করে। কিন্তু কট্টরপন্থী কিছু লোক বলবেন যে, একটি গল্পের আসল বার্তা বোঝা খুব জরুরি। তাদের মতে, যদি কেউ না জানে যে কাজটি কেন তৈরি করা হয়েছে, তবে সেই চরিত্রে কাজ করার কোনো অধিকার নেই, যেন কেউ একটি উপাসনালয়ে ঢুকছে কিন্তু জানে না কেন সেখানে এসেছে।

এই ধরনের কট্টরপন্থীদের কথা বাদ দিতে হবে। থিমের বিষয়ে গভীর, নিজের ভেতর থেকে আসা অনুভূতি দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করা যেতে পারে। তারপর নিজের মতো করে বিষয়টিকে কেবল একটি ভালো কাজ তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে হবে, যেন থিমটা একটি কাজের হাতিয়ার, যা দিয়ে চরিত্রটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

থিমকে এমন কোনো বিশাল ধারণা হতে হবে, এমনটা ভাবার কারণ নেই, যা কোনো খাবারের টেবিলে ঘোষণা করলে সবাই গভীর নীরবতায় ডুবে যাবে। এটি হয়তো জীবনের একটি সাধারণ সত্যও হতে পারে। অথবা একটি কাজে একাধিক, পরস্পরের সাথে জড়িত থিমও থাকতে পারে। আর্থার মিলার বলেছিলেন, সাহিত্যের প্রায় সমস্ত থিমই মূলত "যেমন কর্ম তেমন ফল" এই ধারণার বিভিন্ন রূপ।

শেষ পর্যন্ত গল্পের থিম সম্পর্কে এক ধরনের অনুভূতি তৈরি করতে হবে। এটি কাজকে কার্যকরভাবে বিশ্লেষণ করার একটি উপায় দেওয়ার পাশাপাশি, শিল্পকর্মটি উপস্থাপনের পেছনে উদ্দেশ্য কী, তার সাথে যুক্ত করবে। আর এই উদ্দেশ্যবোধ কাজের মধ্যে বাড়তি আবেগ ও শক্তি সঞ্চার করবে।

কিছু সম্ভাব্য থিম

গল্পের কিছু সম্ভাব্য মূলভাব বা বার্তা এরকম হতে পারে:

- ভাগ্যকে কি আসলে বদলানো যায় না?
- জীবন তার নিজের পথ ঠিকই খুঁজে নেয়।
- মানুষকে কোনো একটা নীতির উপর ভরসা করে বাঁচতে হয়।
- নিজের ক্ষমতাটা জানা উচিত, নইলে কিন্তু সর্বনাশ হতে পারে।
- বড় কিছু পেতে হলে, বড় ঝুঁকি নিতেই হয়।
- পাপ বা সত্যি কথা বেশিদিন চাপা থাকে না।
- লোভ, অহংকার, লালসা, আত্মসন্ত্রিস্তা, রাগ বা বাড়াবাড়ি রকম আদর্শবাদ সবকিছু শেষ করে দেয়।
 - এইসব দোষগুলো হাসির পাত্র করে তুলবে।
 - ভালো কাজের (যেমন দান করা, কঠোর পরিশ্রম, সংযম) পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া যায়।
 - পৃথিবীতে কিছু খারাপ শক্তি আছে যাদের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে।
 - বাড়ি ফেরার জন্য যা যা করা দরকার, তাই করতে হবে।
 - যা কিছু দারুণ আকর্ষণীয়, তা কিন্তু ক্ষতিকরও হতে পারে।
 - একসময় সরলতাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হয়।
 - অতীতের জন্য মানুষকে দায়িত্ব নিতে হয়, ক্ষমা করতে হয় বা ভুলে যেতে হয়।
 - একটি রোমান্টিক ধারণা বা স্বপ্নের পেছনে ছুটলে কষ্টই আসে।
 - সমাজ, প্রযুক্তি বা ব্যবসা মাঝে মাঝে একদম হৃদয়হীন হয়ে যায়।
 - খারাপ শক্তি মানুষের আত্মাকে পুরোপুরি শেষ করতে পারে না।
 - একজন মানুষ, একটি জুটি বা একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।
 - একজন মানুষও চাইলে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে।
 - একসাথে থাকলে অনেক শক্তি পাওয়া যায়।
 - পরিবার অনেকটা যুদ্ধের মতো, যেখানে টিকে থেকে জয়ী হতে হয়।

- পরিবার যতই এলোমেলো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারাই আপনাকে আগলে রাখে।
- মানুষ একে অপরের কাছ থেকে তাদের দরকারি জিনিস খুঁজে নেয়।
- মানুষ সহজে সন্তুষ্ট হতে জানে না।
- পরম সত্য কী, সেটা না জেনেও আমাদের সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।
- এই পৃথিবীর উদাসীনতায় দুর্বলরা পিষ্ট হবে।
- বেঁচে থাকার জন্য আমাদের মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে।
- জীবনকে বোঝার চেষ্টা না করে বরং তাকে দু'হাত ভরে গ্রহণ করা উচিত।
- ঈশ্বর বা জীবন যেন আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে।
- ভালোবাসাই সবকিছুর মূল।

একজন শিল্পী হিসেবে জীবনে এমন কাজ খুব কমই আসবে, তবে কিছু দুর্বোধ্য নাটক বা ছবি থাকতে পারে, যেখানে থিমকে মুখে বলা প্রায় অসম্ভব। ঠিক যেমন একটি যন্ত্রসংগীতের বা একটি বিমূর্ত ছবির বার্তা বর্ণনা করা কঠিন। হয়তো সেই উপস্থাপনাটা কেবল একটি আবেগগত প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যেই তৈরি; আর থিমটা হয়তো শুধু একটি বিশেষ, বারবার আসা রূপ বা মোটিফ হিসেবেই বোঝা যাবে। হয়তো এটা শুধু বলতে চায়: "আপনি আনন্দিত হতে পারেন" বা "আপনি আতঙ্কিত হতে পারেন।" এই ধরনের কাজকে "পারফরম্যান্স আর্ট" হিসেবে ভাবা যেতে পারে, আর এই ধরনের কাজ মঞ্চের চেয়ে বরং কোনো জাদুঘর বা মানসিক হাসপাতালে প্রদর্শিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।